আক্রান্ত

নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

মা যখন মারা যায় তখন ঋকের বয় ছিল মাত্র সাত বছর। অতো অল্প বয়সের স্মৃতি স্পষ্টভাবে অনেকেরইমনে থাকে না। সময় যত এগিয়ে যায় স্মৃতিগুলোও হয়ে যায় ঝাপসা। দশবছর বাদ ঋকেরও অনেক কিছু মনে নেই। কিন্তু মা যেদিন মারা যায় সেই দিনের মেঘলা সকালটা আজও তার স্পষ্ট মনে আছে।

এখনও সময়টা সকালই। ঘড়িতে আটটা বাজে। জানলা দিয়ে রোদের পাতলা একটা রেখা টেবিলের নিচেঋকের পায়ের কাছে চুপচাপ স্থির হয়ে আসে। চোখের সামনে বই খোলা। কিন্তু একেবারে মন বসছে না পড়ায়। গত কয়েদিন ধরেই তার মন ভীষণ বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। আর দু-মাস বাদেই উচচ - মাধ্যমিক পরীক্ষার টেস্ট শু হবে। কিন্তু ঋক বুঝতে পারছে তার প্রস্তুতি ভাল হচ্ছে না। কেন তার মন এরকম বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে?

যেমন এই মুহূর্তে সে পড়ার বই খুলে পড়তেই চাইছিল। কিন্তু হঠাৎই মায়ের কথা মনে পড়ল। ঠিক মায়ের কথা না। সেই সকালটার কথা। পড়া ভুলে ঋক ভাবছিল। হুবহু মনেও আসছিল যেন সব কিছু।

সেদিনের সকালটা ছিল আজকের মত রোদ ঝলমলে নয়। ঘোর মেঘলা। হাতি - রং মেঘে ছেয়ে ছিল আকাশ। ইকড়ি মিকড়ি নখ দিয়ে আকাশের অপার পেট মাঝে মাঝে চিরে দিচ্ছিল বিদ্যুৎ। গম্ভীর ডাকও ছিল মেঘের। আর ছিল থেকে থেকে ঝোড়ো হাওয়ার দাপট। অশান্ত সেই ঘুর্ণি হাওয়ার বৃষ্টির আভাস ছিল মাত্র। এ্যাতো সাজগোজের পর্য একফোঁটা বৃষ্টি হয়নি। সেই ভোরবেলাই বাবা বেরিয়ে গিয়েছিল বাড়ি থেকে। কোথায় গিয়েছিল ঋক জানে। হাসপাতালে। তিনদিন আগে মা যে হাসপাতালে গিয়েছিল। এটাও স্পষ্ট মনে আছে ঋকের। বেশ কিছুদিন ধরেই ভুগছিল মা। প্রায়ই ডাক্তার অ াসত বাড়িতে। ইনজেকশান দিত মাকে। ওষুধের ঝাঁঝালো গন্ধে ভরে থাকত ঘর। ত্রমশ অসুখটা যেন বাড়ছিল মায়ের। কিছুতেই সারছিল না। ঋক জিজ্ঞেস করলে মা ম্লান হেসে বলত--- আমার হাড় মড়মড়ি রোগ হয়েছে বাবা। আর কে ানদিন সারবে না...।

তখন বুঝত না। পরে বুঝেছে ঋক। মায়ের আসলে বোন্-ক্যানসার হয়েছিল।

মা যেদিন হাসপাতালে যায় সেদিন প্রথমে তেমন কিছু মনে হয়নি ঋকের। শুধু মা-কে ছেড়ে কোনওদিন একা থাকেনি বলে মনটা কিরকম ফাঁকা লাগছিল। গাড়িতে ওঠার সময় ম ঋকের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছিল--- ভালো হয়ে থাকবে সোন া। আরতির কথা শুনবে। দুধ খেতে গিয়ে দুষ্টুমি করবে না।

---আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

--- না সোনা। আমি যেখানে থাকব সেখানে ছোটদের যাওয়া বারণ।

--- তুমি কবে ফিরে আসবে মা? ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলেছিল ঋক।

--- আমি ? ...থেমে ছিল কিছুক্ষণ না। তারপর বলেছিল--- দেখা যায়ক। ঠাকুরের ইচ্ছে হলেই আবার ফিরে আসব।

কিন্তু আর ফিরে এলো না মা। একদিন সকালে হঠাৎই ফোন বেজে উঠেছিলল। বাবা রিসিভার তুলে কিছুক্ষণ কথা বলার পর কিরকম যেন অস্থির হয়ে উঠেছিল। কয়েকবার পায়চারি করল। দু হাত মাথা চেপে সোফার ওপর গুম হয়ে বসেছিল বেশ কিছুক্ষণ। তারপর বাড়ির সবসময়ের কাজের মেয়ে আরতিকে ডেকে বলেছিল--- আজ ভোর থেকে তোর বৌদি

সেনসলেস হয়ে আছে। গতকাল অপারেশনের পর তো ভালোই ছিল। তারপর কী যে হল...। আমি এখনই হাসপাতালে যাচ্ছি। ছেলেটার নিকে নজর রাখিস...।

মেঘলা আকাশের দিকে তাকিয়ে ঋক মনমরা হয়ে বারান্দায় বসেছিল। বাবা বেশ হন্তদন্ত অবস্থায় বেরিয়েগেল বাড়ি থেকে। রোজকারর মত তাকে টা টা অব্দি করল না। খুব অভিমান হয়েছিল ঋকের। কেন সেরে উঠছে না মা? কেন সুধু হ াসপাতালেই পড়ে আছে। সাতদিন হয়ে গেল মায়ের সঙ্গে দেখা হয়নি ঋকের।...

অতো সকালেই আকাশ ঘোর অন্ধকার। বিদ্যুতের ঝলক। মেঘের গর্জন। সব অগ্রাহ্য করে বারান্দায় চুপচাপ বসেছিল ঋক। আরতি বলল--- ঘরের মধ্যে ঋক। এখুনি বিস্টি নামবে।

ঋক সাড়া দিল না।

গরম দুধের গ্লাস হাতে আরতি কাছে এল। --- ঘরে চলো বলছি। দুধটা খেয়ে নাও। আরতির হাত থেকে এক টানে দুধের গ্লাস নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল ঋক। গ্লাসটা দেওয়ালে লেগে ঠং করে বিসদৃশ আওয়াজ হল। ছিটকে পড়া দুধে নোংরা হল মেঝে। ভয়ংকরভাবে চোখ বাঙিয়ে ঋক স্তম্ভিত আরতিকে বলেছিল---- একেবারে বিরক্ত করবে না আমাকে। বিরক্ত করবে না। যাও...।

তারপর সে নিজেই বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে বালিশে মুখ ডুবিয়ে কাঁদছিল। খানিক পরে নিজের মনেই রং - পেন্সিল নিয়ে ড্রয়িং করতে বসল ঋক। আঁকল একটা গাছ। আর একটা সূর্য। কি মনে হতে সূর্যটাকে কেটে দিল। কালো রং দিয়ে হিজিবিজি করে দিল গাছটাকেও। শুধু একের পর এক সাদা পৃষ্ঠায় হিজিবিজি কাটছিল ঋক। বেং সেই পাতাগুলো ছিঁড়ে কুটিকুটি করে ঘরময় ছড়িয়ে দিচ্ছিল। একসময় অভু ক্ত, দুঃখী, ক্লান্ত ঋক কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিল।

অনেক বেলা অব্ধি ঘুমিয়ে ছিল ঋক। যখন ঘুম ভাঙল দেখল সামনে দাঁড়িয়ে আছে বাবা। কিরকম অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছিল তাকে। ঋক ধড়মড় করে উঠে বসেছিল। বাবাকে কিরকম অচেনা লাগছিল তার। ঋককে কোনো তুলে নিয়েছিল বাবা। তারপর বলেছিল --- তোমার মা...। চলো, তোমার মাকে কেবার দেখবে। বাবার বলার ধরনেই কান্না পেয়ে গিয়েছিল ঋকের।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর বছরখানেক ঘুরতে না ঘুরতেই ঋকের বাবা আবার বিয়ে করে। সেই মহিলাকে, যার নাম শর্মিষ্ঠা, ঋক প্রথম দিন থেকে পছন্দ করেনি। তার সমসময় মনে হত উড়ে এসে জুড়ে বসার মত এই মহিলা এ বাড়িতে মায়ের জায়গা দখল করতে চাইছে। শর্মিষ্ঠার বিদ্ধে ঋকের মনের অন্ধকারে একটা নিরেট প্রতিরোধের পাঁচিল গড়ে উঠছিল ক্রমশ। এই দশ বছরে সেই পাঁচিলটা অনেক অনেক উঁচু হয়ে গেছে।

।।দুই ।।

কয়েকদিন ধরে ঋকের মন যে বিক্ষিপ্ত এবং অস্থির হয়ে আছে তার কারণ হল, পারমিতা আজকাল তাকেআর তেমন পাত্ত া দিচ্ছে না। কেন এরকম হচ্ছে তা বুঝতে না পারলেও, এটুকু বুঝতে ঋকের ভুল হয়নি যে, পারমিতা তাকেস্পষ্টতই এড়িয়ে যেতে চাইছে। অতচ গত একবছর ধরে গাঢ় মেলামেশা চলছে তাদের। কত মায়াবী বিকেল, কত উজ্জ্বল সন্ধে তারা দুজনে একসঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছে রাস্তায়। ইচ্ছে হলেই ঢুকে গেছে প্রেক্ষাগৃহের সুবিধেজনক অন্ধকারে। স্কুলে প্রতিদিন যাতায় াতের রাস্তায় চোখের ইশারায় হৃদয়ের উষ্ণতার বিনিময়। রাত জেগে আবেগে থরোথরো অবস্থায় চিঠি লেকা অজস্র। সুযোগ বুঝে পারমিতার হাতে চালান করে দেওয়া সেইসব চিঠি। বিনিময়ে চিঠি পাওয়া। ঋকের টেবিলের ড্রয়ার বোঝাই হয়ে আছে চিটিতে। বেশ কিছু চিঠির বান্ডিল গোঁজা আছে ঋকের বিছানার তোষকের নিচে। কিন্তু ইদানীং পারমিতার কী হয়েছে? কেন সে কোনো যোগাযোগ রাখতে চাইছে না ঋকের সঙ্গে? ... এখন স্কুলে গরমের ছুটি চলছে। তাই পারমিতা নিজে থেকে ঋকের সঙ্গে দেখা না করলে তার সঙ্গে যোগাযোগ করার অন্য কোনো উপায় নেই।

---হ্যালো - কী ব্যাপার?

--- আমিই তো জিজ্ঞেস করছি কী ব্যাপার? হঠাৎ একেবারে চুপ হয়ে গেল? খোঁজখবর নেই? শরীর খারাপ? ...ঋক জজ্ঞেস করল।

---নাহ, সেরকম কিছু নয়।

--- কী লে ?
--- কবে দ্যাখা হবে ?
--- বললে পারছি না।
--- হঠাৎ এরকম ব্যবহারের কারণ ?
--- বলতে পারছি না।
--- কী হয়েছে বলো তো তোমার? আমাকে এরকমভাবে এ্যাভয়েড করতে চাইছ কেন?
উত্তর নেই।
---হ্যালো -- পারমিতা ? শুনতে পাচ্ছো আমার কথা ? উত্তর নেই। হঠাৎ পি পি আওয়াজ সূচের তীক্ষনতায় বিঁধে যায় ঋকের কানে। রিসিভার নামিয়ে রেখেছে পারমিতা।

।। তিন ।।
ঋক... ঋক... ঋক? ও ঘর থেকে বাবা ডাকছে, এবার এক প্রস্থ শাসন শু হবে ঋক জানে। কেন সু হবে তাও আঁচ করতে প
ারে সে। ওই মহিলা, যাকে ভুলেও যাতে মা না জাকতে হয় এ ব্যাপারে প্রতিমুহূর্তে সচেতন চেষ্টা ঋকের, নিশ্চয়ই চুকলি
কেটেছে আজ বাবার কাছে।
আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাড়ি কামাতে ব্যস্ত বাবা। এক গালে সাবানের ফেনা। আর এ গালে চলমান রেজারের দাঁদ।
ঘরের এক কোণে বড় আলমারির আয়নার ভেতরে বাবারর প্রতিবিম্ব দেখছে ঋক। ডান হাতে রেজর চলছে। আয়নার
ভেতর ঋক দেখছে বাঁ - হাত।
--- তোমার পড়াশোনার খবর কী?
--- চলছে।
--- চলছে মানে ? টেষ্ট কবে ?
--- নভেম্বর।
--- আর এটা জুলাই। তিনমাস। ঠিক তিনমাসও নয়। দুমাস। অক্টোবরে পুজো। ওই সময় পড়াশোনা হয় না। হুজুগে
হুজুগেই কাটে।
গালে আফটার - সেভ লোশন লাগাচ্ছে বাবা। ঝাঁঝাঁলো মিষ্টি গন্ধ। বাবা যে লোশনটা ব্যবহার করে প্রায়ই সেটার বিজ্ঞ
াপন দেখে ঋক টিভিতে। প্রথমে দ্যাখা যায় একজন পুষের ধারালো মুখ। তারপর একটা পেলব হাত এগিয়ে আসে। সেই
হাতের লম্বা এবং তীক্ষন নখে নেলপালিশের ঝলক। সেই হাতের আঙুলগুলো সরীসৃপের ভঙ্গীতে এঁকেবেঁকে উঠে আসে
পুষের বুকে। একটা একটা করে খুলতে থাকে তার জিনস্ শার্টের বোতাম। যেন নিষিদ্ধ গুহার জটিল অন্ধকারে হাত চাল
াচ্ছে এভাবে সন্তর্পণে কিন্তু সর্পিল সম্প্রতিভতায় শার্টের বোতাম খুলে খুলে ক্রমশ ওপরের দিকে এগিয়ে অসাছে অ
াঙুলগুলো। গলারর কাছে শেষ বোতামটা খোলার মুহূর্তে পুষালি হাতের চ্যাটালো চেটো কিলবিল - করা সেই আঙ্গ
ুলগুলো থামিয়ে দ্যায়। সেই মুহূর্তে পর্দায় ভেসে ওঠে ওই লোশনটার---
কী হল ? ওভাবে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছো কেন ? ধমকে ওঠে বাবা।
ঋক কি বলবে বুঝতে পারে না। বাবার মুখের দিকে তাকায়। রাগ থমথম করছে সেখানে।
--- তার মানে টেস্টের প্রিপারেশানের জন্যে ই ফ্যাক্ট আর দু-মাস আছে। তা সত্ত্বেও তুমি আজকাল কোচিং ক্লাস কামাই
করছ ?
--- গতকালই মাত্র যাইনি।
--- কেন ? যাওনি কেন? উইকে মাত্র তিনদিন। মাসে আটশ টাকা গুনে গুনে দিতে হচ্ছে আমায়। আর তুমি তা কামাই
করবে? কোচিং - ক্লাসে নিয়মিত না গেলে সায়েন্স গ্রুপে তুমি তো পাশই করতে পারবে না। আমি তোজানি --- মালমশল
া তোমার ভেতরে কি আছে? ঠিক এই মুহূর্তে ঘরে ঢোকে শর্মিষ্ঠা। রীতিমতো হাত নেড়ে বলতে শু করে--- কি যে হয়েছে অ
াজকাল ওর ? শুধু বিছানায় শুয়ে শুয়ে কুঁড়েমি করা। কোনো উদ্যোগই নেই। বিনা কারণে গতকাল কোচিং - ক্লাস কাম

াই করল। শুয়ে শুয়ে টেপ- রেকর্ডার চালিয়ে উল্টোপাল্টা গান শুনল। ...আমি বলতে গেলে কি বলল জানো? আমার এখন কিছু ভালো লাগছে না। যাও--- আমাকে বিরক্ত করো না। এ আবার কি কথা বলার ধরণ। আমাকে ও একেবারে ম ানতে চায় না।...

---এসব আমার একেবারেই পছন্দ নয়। --- বলতে বলতে বাবা এগিয়ে আসে ঋকের দিকে। বাবা আর ঋক এখন মুখে ামুখি। সতেরো বছর বয়সেই ঋক বাবার মাথাকে ছুঁয়ে ফেলেছে। বাবার গাল থেকে মিষ্টি এবং উত্তেজক গন্ধ ঋকের নাকে লাগছে।

---এরপর যদি বিনা কারণে কোচিং কামাই করার রিপোর্ট পাই, তাহলে কোচিং থেকে ছাড়িয়ে দেব তোমায়। বুঝেছো ? ইউ উইল ম্যানেজ ইওর ওন অ্যাফেয়ার্স। তার ফল কী হবে আমি জানি । হায়ার - সেকেন্ডারিতে গোল্লা! আর তাই যদি হয় ...

তাই যদি হয় তাহলে কি হলে সেটা যেন ভাবনায় ছিল না বাবার। তাই থেমে গিয়ে হঠাৎ ভাবতে শু করে। বাবার চর্বি-থলথলে গোল মুখটা রাগের প্রবাবে কিরকম বিকৃত দ্যাখাচ্ছে। ঋক সেদিকে তাকিয়ে থাকে।

---আর শোন। ---আবার বলে বাবা। ---তুমি কাউকে অপছন্দ করতে পারো। কিন্তু ডিসরেসপেন্ট করার রাইট তোমার নেই। ... শী ইজ ইওর মাদার...! ...কে মাদার? ওই মহিলা? নাহ, ও আমার মা নয়। জীবনে মা একজনই পাওয়া যায়। দুজন নয়...। মুহূর্তে ঋকের মনের মধ্যে কথাগুলো কিলবিল করে ওঠে। কিন্তু তার মুখ আর চোখ একইরকম ভাবলেশহীন থাকে।

--- আর একটা কথা তোমার গুণধর ছেলেকে বলে দাও! যতো বখাটে ছেলেদের সঙ্গে আজকাল আড্ডা শু হয়েছে! সময় নেই, অসময় নেই, শুধু বাইরে যাবার জন্যে ডাকবে ওকে। এভাবে যদি রাস্তার ছেলেদের মতো ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়ায়, তাহলে পড়াশোনাটা করবে কখন? ডাহা ফেল মারবে ও বলে দিলাম...।

---আর ফেল মারলে এ বাড়িতে জায়গা হবে না। কীপ ইট ইন মাইন্ড..। যেন এতক্ষণ বাদে জুতসই কথাটা খুঁজে পেয়েছে এভাবে বলে বাবা। --- পড়াশোনায় মন দাও। সময় এবার নষ্ট কোরো না। পরে পস্তাতে হবে। আবার সেই জ্ঞানের কথা বাবার মুখে। একই ক্যাসেট এখন শুনতে হবে। ঋকের বিরক্তি লাগে। সে চলে যাবার জন্যে পাবাড়ায় ।

--- যেগুলো বলছি সেগুলো ঢুকল কানে?

---শুনলাম

উঃ কী ঔদ্ধত্য ছেলেটার! রাগে কান-মাথা গরম হয়ে যায় বাবার। যতই বলো, কোনো প্রতিক্রিয়া নেই ছেলেটার । এটাই সবথেকে গরম করে দ্যায় মাথা। হাত চালিলয়ে দিতে ইচ্ছে করে। কিন্তু নিজেকে সংঘত করে নেয় বাবা। এতবড় ছেলেকে মারধর করলে আরও অবসটিনেসি গ্রো করে যেতে পারে। তাছাড়া আজ তার অফিসে বোর্ড মিটিং। মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। মাথা গরম করলে নিজেরই ক্ষতি। ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার মুহূর্তে ঋক অনুভব করে শর্মিষ্ঠার চোখের জ্বলন্দ দৃষ্টি ত ার পিঠ পুড়িয়ে দিচ্ছে। প্রতিক্রিয়া হয় তার। যত দ্রুত পারে সে চৌকাঠ পেরিয়ে যায়।

ও - ঘরে এখনও কথা চলছে। ঋকের কানে আসে। শর্মিষ্ঠা বলছে -- ছেলেটাকে আমি একেবারে বুঝতে পারি না।

--- চেষ্টা করো বুঝতে...।

---আর কতে চেষ্টা করব? এ্যাতো বছর ধরে অনেক চেষ্টা করেছি। ও আমাকে অ্যাকসেপ্ট করতে পারেনি। বাবা কি বলছে আর শুনতে চায় না ঋক। তার তলপেটে মৃদু চাপ। সে বাথমে সেঁধিয়ে যায়। ঝাঁঝরির কাছাকাছি দাঁড়িয়ে পেচ্ছাপ করতে করতে করতে সে দ্যাখো একটা ডেয়ো পিঁপড়ে ভিজে, নোনা - লাগা, স্যাঁতসেঁতে দেয়াল বেয়ে কোথাও একটা পৌঁছতে চাইছে? কোথায় পৌঁছবি তুই শালা? ঋক টার্গেট করে তার পেচ্ছাবের স্রোত দিয়ে এলোমেলো করে দিতে চায় পিঁপড়েটার চেষ্টাকে। দেওয়াল থেকে পঁপড়েটা পিছলে পড়ে গেল নর্দমায়। খানিকক্ষণথমকে দাঁড়িয়ে, পরিস্থিতি বুঝে নিয়ে নর্দমার স পথরেখা ধরেই আবার ধীরে ধীরে এগোতে চাইচে পিঁপড়েটা। ঋকের পেচ্ছাব শেষ। হঠাৎ তার জেদ চেপে য ায়। বালতি থেকে মগে জল তুলে আবার সে টার্গেট করে ফেলতে থাকে পিঁপড়েটার একরক্তি কালো শরীরে। ... কোথাও যেতে দেব না কোকে...! চারদিক থেকে জলপ্রপাতের স্রোত দুর্দম গতিতে আছড়ে পড়ছে কেন, আমার ওপর? ভাবছিল ক্ষুদে পিঁপড়েটা। বাবছিল আর স্থির রাখতে চাইছিল। সামনের দুই পা তুলে বিনীত ভঙ্গীতে একবার বলতেও চাইল---

ওগো মানুষ, আমাকে বাঁচতে দাও, নিজের রাস্তায় খেয়ালখুশিমত নিরাপদে চলতে ফিরতে দাও আমাকে...!
মগ থেকে বারবার জল ফেলে ঋক আঘাত করছে পিঁপড়েটাকে। কিরকম এ বিচিত্র ধরনের উল্লস অনুভবকরছিল সে নিরীহ প্রাণীটার ওপর এই অত্যাচার করে। ... তোকে বাঁচতে দেব না শালা। কোথাও য়েতে দেব না। পৌঁছতে দেব না কোথাও। আমরা কেউ কোথাও পৌঁছতে পারব না। শুধু খাদের ধারে খেঁষে ঝুলে থাকব। নিচে, অনেক নিচে অতল খাদের হিম অন্ধকার বারবার মাথা ঘুরিয়ে দেবে আমাদের!
---ঋক? একক্ষণ কি করছো তুমি বাথমে? অফিসটফিস যেতে দেবে তো আমায়--- না কী ? তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে আসো ঋক। মেন তোয়ালে জড়ানো বাবা দাঁড়িয়ে আছে। কলাপলে বিরক্তির ভাঁজ। মুখ নিচু করে পাশ দিয়ে চলে যাবার সময় ঋক আবার সেই মিষ্টি এবং উত্তেজক গন্ধটা পেল। ...তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল নখের একটা সিল্ক-মসৃণ, পেলব হাত শরীসৃপের মত কিলবিল করে উঠে আসছিল সেই পুষের বুকে - গলার কাছে...।
শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছে। এরকম সময়ে ঋক জানে, একটা সিগারেট খেতে পারলেই আবার চনমনে লাগবে। কবে যে স্বাধীান হতে পারবে। ইচ্ছেমতো আচরণ করতে পারবে বাড়িতে। এখন ছাদে গিয়ে অবশ্য সিগারেট ফুঁকে আসা যায়। কিন্তু এই বহুতল বাড়ির ছাদ বারোয়ারী। এই সময় কেউ কেই যেতেই পারে ছাদে - কাপড় শুকোতে দিতে বা অন্য কোনো কারণে ব্যাপারটা কুব ভালো দেখাবে না। ক্লাশ টুলেয়ভের ছাত্রের এবাবে প্রায় প্রাকাশে সিগারেট খাওয়া নিয়ে কিচাইনও বেধে যেতে পারে।
বই সামনে খুলে পড়ার ভানটা রাখতেই হয়ে। নাহলে আবার ওই মহিলা বাবার কাছে চুকলি কাটবে। কিংবা নিজেই এই ঘরে এসে ভ্যাজর শু করবে। যেন ঋকের ভূত-ভবিষ্যতের ইজারা নিজের হাতে নিয়েছে ও। সব ব্যাপারে তার পেছনে গোয়েন্দাগিরি করা, জ্ঞান দিতে আসা, গার্জেনগিরি ফলাবার চেষ্টা করা একেবারেই পছন্দের নয় ঋকের। একটু হাঁফ ছেড়ে , হাত - পা ছড়িয়ে নিজের মত তাকে বাঁচতে দেবে না এর। বিশেষত ওই মহিলা। ঋককে পুরোপুরি নিজের কব্জায় আনতে চায় প্রতিমূহূর্তে। কিন্তু ঋক তা কোনোদিনই হতে দেবে না।
এই জানালাটা দিয়ে আকাশ দ্যাখা যায়। আজকের আকাশ দেখে মনে হয় যে আজ কোনো উৎসব। ঝাঁ-চকচকে নীল-নীল অপার শূন্যতা। ছিটেফোঁটা মেঘ। ত্রিসমাস পুড়োর চুলের রং মেঘেদের । এক টা চিল আর একটা চিলকে চত্রাকারে অনুসরন করছে। ওরা কী প্রেমিক ও প্রেমিকা? ঋক সেদিকে তাকিয়ে থাকে। ... এরকম একটা সুন্দর - উজ্জ্বল দিনে পারমিতাকে নিয়ে যদি কোথাও বেরিয়ে পড়া যেত ? একটু বাদে একবার ফোন করে দেখবে কি ? কিন্তু ...। গতকাল ফোনে পারমিতার গলা অতো ঠাণ্ডা মনে হয় কেন? কোনো কারণে সে কি ঋকের প্রতি বিরক্ত? কী হতে পারে ? এক বছরের মেলামেশায় পারমিতাকে কোনোদিন এ্যাতো উৎসাহহী, উচ্ছ্বাসহীন, অচেনা এবং দূরের মনে হয়নি। কিন্তু হঠাৎ এই পরিবর্তন?... চিলগুলোকে আর দেখতে পাচ্ছে না। হয়তো ওরা অন্য কোনোদিকে, নিজস্ব নির্জনতার দিকে বেঁকে গ্যোছে। প্লেটের সঙ্গে চামচের ঘর্ষণের রিনরিনে শব্দ কানে আসছে। খেতে বসেছে বাবা। জানলা দয়ে ঋক দেখতে পাচ্ছে--- বাবার অফিসের গাড়ি এসে গ্যাছে। স্টিয়ারিং-এর সামনে চুপচাপ বসে ড্রাইভার উদাস ভঙ্গিতে দূরের দিকে তাকিয়ে আছে।
... কি কারণে বিরক্ত হতে পারে পারমিতা? একটা ব্যাপার হঠাৎ মনে হয় ঋকের কিন্তু সেটাই কি ইদানীংপারমিতার ঋককে আগ্রহ্য করার কারণ? তারপর তো অনেকদিন কেটে গেছে। একমাসেরও বেশী। এর মাঝে একদিন সিনেমাও গেছে তারা দুজনে।
সেই ঘটনাটা ভাবছিল ঋক। লঞ্চে নদী পার হয়ে তারা চলে গিয়েছিল সেই জায়গাটায় সেখানে শুধু প্রেমিক-প্রেমিকারই যায়। প্রিয়ডনকে পাশে নিয়ে বসে এখানে নদীর দিকে তাকিয়ে থাকা যায় ইচ্ছেমতো। জলে বাসমান অস্পষ্ট বাড়িঘর। আজ হয়তো নোঙরকরা আছে। কালই আবার অন্তহীন সমুদ্রের দিকে চলে যাওয়ার অবাধ স্বাধানতা। দোতলা, তিনতলা, চারতলা কিংবা আরও উঁচু সেই ধাতব বাড়িগুলোর জানালায় অস্পষ্ট কোনো মুখ, ডেকের রেলিং-এ হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে একা মানুষ, তার পাইপের ধোঁয়া মিলিয়ে যাচ্ছে শূন্যে। পারমিতা পাশে বসেছিল। ঋকের মনে হচ্ছিল সে আগুনের পাশে বসে আছে। চকোলেট রং-এর স্কার্ট এবং হলুদ টপ-এ অসহ্য রমণীয় উত্তাপ ছড়াচ্ছিল পারমিতা। দূরে নদীর ওপারে--- ফ্লাওয়ার মিল থেকে ছুটির ভোঁ বেজে উঠেছিল। কিন্তু অন্ধকার তখনও নামেনি। আশেপাশে মানুষজন, হকার, তাদের মত প্রেমিক-প্রেমিকা, উদাসীনভাবে ঘুরে বেড়ানো দু-একটা পুলিশ ভয় পাচ্ছিল ঋক। পারমিতার হাত নিজের থাব

ার মধ্যে টেনে নেওয়া প্রবল ইচ্ছে সে কষ্টে দমিয়ে রেখেছিল।
নদীর পাড়ে নৌকোর ভেতর থেকে তাদের মত একজোড়াকে নেমে আসতে দেখে ঋকের মাথায় মতলবটা এসেছিল।
---নৌকো চাপবে ?
---সাঁতার জানি না কিন্তু। হেসে বলেছিল পারমিতা। সেদিন সে সারাক্ষনই হাসছিল। হাওয়ায় ভর দিয়ে যে নেচে নেচে বেড়াতে চাইছিল।
---আমি তো জানি।
--- ডুবতে বসলে তুমি আমাকে বাঁচাতে পারবে?
উত্ত না দিয়ে ঋক হাত নেড়ে মাঝিকে ডেকেছিল। অবিকল আবদুল মাঝির মত দেখতে লোকটাকে। চেকলুঙ্গি, মেদহীন বয়স্ক, চকচকে শরীর, চিবুকে দাড়ির তীক্ষ্ণ ত্রিভূজ। এক ঘন্টার জন্য পঁচিশ চাইল লোকটা। দরাদরি করে কুড়ি। বাঁশের প াটাতন বেয়ে ঋকের হাতে ভর রেখে নৌকোয় উঠছিল পারমিতা। মাঝি নৌকোটাকে মৃদু চালিয়ে পাড় থেকে বেশ কিছুটা দূরে নিয়ে গিয়ে থামিয়ে দিল। নৌকো ভেসে রইল একই জায়গায়।
---আর একটু যাবে না ? পারমিতা জিজ্ঞেস করল। চলো ওই জাহাজটার কাছে যাই। নামটা দেখেছো জাহাজের? সী-প্রিন্স। চলো ওই রাজপুত্রের সঙ্গে অনেকদূর ভেসে যাই। কেউ খুঁজে পাবে না আমাদের...।
পারমিতার এরকম কথাবার্তায় ঋক তেমন উৎসাহ পাচ্ছিল না। নৌকোর ছইয়ের অন্ধকারে সে টেনে নিয়েছিল পারমিত াকে। তারপর লিপস্টিক-দগ্‌দগে, আঙুরের মত টস্‌টসে ঠোঁটে নিজে ঠোঁট প্রাণপণে গুঁজে দিয়েছিল ঋক। তার হাত উদ্দ াম লোলুপতায় পারমিতার হলুদ টপের পাঁচিল টেনে হিচঁড়ে সরিয়ে দিতে চাইছিল।
---এ্যই - কী হচ্ছে? এরকম অসভ্যতা শু করলে কেন ?
এ কী?
--- আমাকে একটু দাও। বারণ কোরো না।...।
পারমিতার ঘাড়ে, কপালে, চোখের পাতায়, গলার খাঁজে, নিটোল, উচুঁ আঁটোসাঁটো পরিপূর্ণ দুই মাংসখন্ডেঋকের ঠোঁট হিংস সংরাগে চলেফিরে বেড়াচ্ছিল। পারমিতা নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করেও পারছিল না। ঋক যে হঠাৎই এরকম দস্যু হয়ে উঠবে সে যেন ভাবতে পারেনি। একসময় কখন যেন পারমিতার প্রতিরোধও ক্রমশ আলগা হয়ে এল। ঠিক ঠিক তার বারবার দামাল হাত ছুঁইয়ে পারমিতাকে জাগিয়ে দিয়েছে ঋক, বাজিয়ে দিয়েছেতাকে। আবশে পারমিতা ঋকের মাথ ার চুল খামছে ধরেছিল। চুম্বনের দংশনে দংশনে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছিল পারমিতার মুখ। নৌকোর ঘেরাটোপের বাইরে অন্ধকার নেমে আসছিল হু হু করে। নৌকোর অন্য প্রান্তে, --- এধারে কী ঘটছে সে ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন ও কে বসে অ াছে নিয়তির মত ? তার বিড়ির আগুন জ্বলছিল ধিকিধিকি।
সেদিন বাড়ি ফেরার সময়, আশর্চ্য, সারা রাস্তা পারমিতা তেমনভাবে আর কথাই বলল না। ঋক অনেক চেষ্টা করছিল ত াকে কথা বলতে। কিন্তু উত্তরে পাচ্ছিল শুধু -- হুঁ হ্যাঁ। এমনকি বাস থেকে নেমে চলে যাবার সময় তেমনভাবে হাতও নাড়ল না। ঋকের মনে হয়েছিল, পারমিতা তার ওপর বিরক্ত হয়েছে।
...তাহলে কি তাই? সেদিন নৌকোর সুবিধেজনক অন্ধকারে ঋক বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিল বলে কি পারমিতা রাগ করেছে? কিন্তু তাই বা কেন হবে ? এরপরও তো তারা একদিন সিনেমা গিয়েছিল। সেখানেও অন্ধকারেরসুযোগে ঋক...।
অনেক ভেবেও ঋক বুঝতে পারছে না পারমিতা কেন তাকে এভাবে এড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তাকে বুঝতেই হবে। জানতেই হবে। য়েভাবেই হোক পারমিতার সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলতে হবে।
---স্নানটা তাড়াতাড়ি সেরে নেবে। দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে শর্মিষ্ঠা --- একে আরতি নেই। একবার দেশে গেলে এদের আর ফিরতে ইচ্ছে করে না। ..তার ওপর ঝি আজ বারোটার মধ্যে এসে বাসন মেজে দিয়ে চলে যাবে--। বিকেলে আসবে না। এখন আর হুট করে কোথাও বেরিয়ে যেও না যেন। আমি বাথমে যাচ্ছি। আমার পর তুমি স্না সেরে নেবে।
দরজার কাছ থেকে শর্মিষ্ঠা সরে যায়। খানিকপরে বাথমের দরজা ভেজানোর হালকা শব্দ হয়। ঋক হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। মিনিট চল্লিশের আগে ওই মহিলা বাথম থেকে বেরোবে না। বাইয়ের র‍্যাকের ফাঁকে গুঁজে রাখা সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট টেনে নিয়ে সে ঘরের পেছনদিকের ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ায়। পাঞ্জাবিরপকেটে থেকে দেশলাই বের

করে ধরায় সিগারেট। এই ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে যতদূর তাকানো যায় ঘাসজমি। ডোবা। স ইঁটের রাস্তা। টিউবওয়েল। বস্তি। ইটের রাস্তা দিয়ে স্কুটার চালিয়ে একজন আসছে। মাথার শ্যাওলা রং-এর হেলমেটে লোকটাকে টিভির পর্দায় দেখা ভারতীয় জওয়ানের মত লাগছে।

।। চার ।।

দুপুর ৩টে নাগাদ সাইকেলের বেল বাজিয়ে তমাল রাস্তা থেকে ডাগছে ঋককে। আলনা থেকে জামাটা টেনে নিয়ে গায়ে গলাল ঋক। জানালা দিয়ে হাত নেড়ে তমালকে বলল--- আসছি---।

সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে যাচ্ছে সেই মুহূর্তে পাশের ঘরের পর্দা সরিয়ে শর্মিষ্ঠা বেরিয়ে এলো। ম্যাক্সিটা আলগাভাবে ঝোলানো সরীরে। চোখে চশমা। যখন বি পড়ে বা টিভি দেখে, তখনই একমাত্র চশমা পরে শর্মিষ্ঠা। এখনটিভি দেখছিল। কেব্‌লে বোধহয় কোনো সিনেমা চলছে। টিভির সাউন্ড যথেষ্ট কমানো। মেয়েলী গলায় চেনা সুরে একটা হিন্দি গান অস্পষ্টভাবে শুনতে পাচ্ছে ঋক। অলকা ইয়াগনিকের গলা। এই সিনেমাট দেখেছে ঋক। কিছুদিন আগে। শাহখ খান আর কাজন অভিনয় করেছে। ঋক একা ছিল না। পারমিতাও ছিল। বস্তুত পারমিতা পাশে থাকতেই সেদিন মনোযোগ দিয়ে ছবিটা দেখতেই পারেনি ঋক। সিনেমাহলের গাঢ় অন্ধকারে তার একটা হাত সর্পিল গতিতে ঘোরাফেরা করছিল পারমিতার শরীরের আনাচেকানাচে। সেদিন শাড়িতে ছিল পারমিতা। এরকম মুহূর্তগুলোত কী আশর্চ্যজনকভাবে মেয়েরা নিজেদের শান্ত ও স্থি রাখতে পারে ! ভাবলেশহীন মুখে, পর্দার দিকে দাকিয়ে বসেছিল পারমিতা। শুধু মাঝেমাঝে ফিসফিস--- একটু আস্তে। এরকম পাগলামি কেউ করে? আশপাশের লোকজন যদি বুঝতে পারে ? ...আর ঋকের মনে হচ্ছিল, সে ফেটে চৌচির হয়ে ছড়িয়ে যাবে...।

---এই ভরদুপুরে কোথায় চললে? থমথমে গলা শর্মিষ্ঠার।

---তিনটে বেড়ে গেছে। এখন ভরদুপুর নয়।

---যাদের সামনে পরীক্ষা, তারা এরকম অসময়ে বেরোয় না।

---সবসময় অতো জ্ঞান দেবার চেষ্টা কোরো না তো? আজকাল বড় বাড়াবাড়ি করছ।

---আবার ওরকম গলা তুলে কথা বলছ? একদিন বারণ করেছি ওরকম ভঙ্গীতে আমার সঙ্গে কথা বলবে না...।

---বেশ করব। সবসময় তুমি আমার ভুল ধরার চেষ্টা করো।

---আজেবাজে ছেলের সঙ্গে মিশে নিজেকে নষ্ট করবে আর শাসন করতে পারবো না ? ...আমাকেও তুমি ভীষণ অগ্রাহ্য কর।

---আমার বন্ধুরা কেউ আজেবাজে ছেলে নয়। সবাই আমার সঙ্গে এক ক্লাশে পড়ে। আমার এখন ফালতু ব্যাপারে তর্ক করার সময় নেই।... আমি বেরোচ্ছি।

শর্মিষ্ঠার পাশ কাটিয়ে ঋক তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায়। দুই চোখে আগুন নিয়ে শর্মিষ্ঠা সেই বেপরোয়া চলে যাওয়া দেখে।

---কী ব্যাপারে রে? ওরকম হাঁফাচ্ছিস কেন? তমাল ঋককে জিজ্ঞেস করে।

---ওই যে এক খিটখিটে মহিলা আছে বাড়িতে। দিনরাত ডোমিনেট করার চেষ্টা আমাকে।

তমাল হাসে

--তোর মা। আর আমার বাবা। রিটায়ার করার পর যেন বুড়ো আরও খেপচুরিয়াস হয়ে গেছে। ঘুম নেই চোখে। বই-কাজগ পড়া নেই। শুধু দারোয়ানের মত দরজার দিকে তাকিয়ে বসে আছে---কে কখন বাইরে যাচ্ছে...। আমি আজকাল কাউকে পাত্তা দিই না যখন মন চায় বেরিয়ে পড়ি। হায়ার সেকেন্ডারিটা যদি পাশ করতে না পারি---

---পাশ না করতে পারলে কী করবি? জিজ্ঞেস করে ঋক।

---হায়ার সেকেন্ডারি কী বলছিস? আমাদের পাড়ার অতীনদা তো মাধ্যমিক ফেল। কেটারিং -এর বিজনেস করে কোথায় উঠে গেছে জানিস? ডান হাতে বালা, গলায় সোনার চেন, বাজাজ স্কুটার হাঁকিয়ে রোয়াবসে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অতীনদার আরো ছেলে লাগবে। বিজনেস স্প্রেড করছে না! আমাকেও অফার দিয়েছে। বাবছি ভিড়ে যাব। দু-পয়সা ইনকাম হবে।

লাইনে একস্‌পিরিয়েনসও হবে...।
তমালের সাইকেলের রড়ে বসে যেতে যেতে ঋক চুপচাপ কথাগুলো শোনে। তার প্লেনের পাইলট হবার খুব শখ। আকাশে উড়ে বেড়াবার অবাধ স্বাধীনতা। কতে বিপজ্জনক সব ঝুঁকি। স্যাঁতসেঁতে বাঙালি জীবন তার একেবারে ভালো লাগে না। কতো নতুন দেশ দ্যাখা যাবে। কতো পাহাড়, সমুদ্র, এয়ারপোর্ট, মেট্রোপলিস। কতো রকম মানুষ। পিঁয়াজের খোসার মত পরতে পরতে জীবন খুলতেই থাকবে শুধু...। কিন্তু সেই স্বপ্ন কী সফল হবে তার? পড়াশোনা যেভাবে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগোচ্ছে তাতে কতদূর যাবে সে?...
আড্ডা তেমন জমল না। শুধু তারা তিনজন। ঋক, তমাল আর প্রতীক। শুভ আসেনি। প্রশান্তও না। ওরা দুজনে কী একটা সিনেমায় গেছে। চা, সিগারেট আর কিছুক্ষণ এলোমেলো গল্পগুজবের পর তমাল জানাল যে তাকেবাজার হয়ে, কয়েকটা জিনিস কিনে বাড়ি ফিরতে হবে। সে চলে গেল। প্রতীক ঋককে বলল--- আয় তোকে আমারসাইকেলে লিফট দিয়ে দি।
বিকেল ক্রমশ সন্ধের আবছা অন্ধকারকে জায়গা ছেড়ে দিচ্ছে। হয়তো ঋককে টানতে হচ্ছে বলেই প্রতীকের সাইকেল ধীর গতিতে চলছে। রাস্তার একটা বিকট গর্তকে পাশ কাটাল প্রতীক। তারপর বলল--- একটা কথা ছিল তোর সঙ্গে ঋক।
--- কী কথা ? বলে ফ্যাল---।
--- আমাকে ভুল বুঝবি না তো ?
--- কী কথা ?
--- আগে বল, আমাকে ভুল বুঝবি না---।
--- কথা দিলাম।
---পারমিতাকে একটা ছেলের সঙ্গে ঘুরতে আর কথা বলতে আমি দুদিন দেখেছি।
--- কার সঙ্গে? কোথায় ? একটা ইঁটের টুকরো সাঁ করে এসে আঘাত করে ঋকের কপালে।
---ছেলেটাকে আমি চিনি। সবুজ সংঘ ক্লাবের ছেলে। সেন্ট টমাসে পড়ে। সবুজ সংঘের ব্যান্ড পার্টিতে ড্রাম বাজাতে দেখেছি ওকে। ওর নাম অর্ণব। ভালো ক্রিকেটও খেলে।
--- সবুজ সংঘ? মানে পঞ্চাননতলায় যে ক্লাবটা ?
--- হ্যাঁ।
--- কখন ঘুরতে দেখেছিল ওদের? ... কোথায় ?
--- থাক বলব না। তুই ভীষণ উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছিস---।
--- প্রতীক... প্লিজ... তাড়াতাড়ি বল---।
--- একদিন--- গত সপ্তাহে - সন্ধের সময় কোচিং থেকে ফিরছি। নটবর পাল লেনের মুখে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ওরা কথা বলছিল। আর গতকাল দেখলাম--- হাওড়া স্টেশনে।
--- হাওড়া স্টেশনে ?
--- হ্যাঁ। গতগাল কলেজ স্ট্রিট যেতে হয়েছিল দাদার সঙ্গে। ট্রেন ধরবার জন্য যাচ্ছি। দেখলুম ওরা দুজন কথা বলতে বলতে প্লাটফর্ম থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। বোধহয় এদিককার ট্রেন থেকে নামল। সাবওয়ে দিয়ে বাসস্ট্যান্ডেরদিকে গেল মনে হল।
---তুই ঠিক দেখেছিস তো ? ... পারমিতাই তো ? নাকি ওর মত দেখতে...।
---পারমিতাকে আমি চিনবো না ? কি যে বলিস। আমার বাড়িতে যাওয়ার রাস্তাতেই তো ওর বাড়ি। তাছাড়া তুইও একদিন আলাপ করিয়ে দিয়েছিলি---।
প্রতীক সাইকেল থামা।
ঋকের বলার ভঙ্গীর মধ্যে এমন একটা দৃঢ়তা ছিল যে ব্রেক কষতে বাধ্য হল প্রতীক।
--- এখানে নামাবি? তোর বাড়ির কাছে নামবি না?
---তুই ফিরে যা প্রতীক। আমি একটু পরে বাড়ি যাব।
প্রতীক তাকায় ঋকের দিকে। গলি থেকে ব্যস্ত হাইওয়ের দিকে হনহন করে হেঁটে যাচ্ছে ছেলেটা। ওদিকটা বাজার, নানা

ধরনের দোকান, বাস - টার্মিনাস। ওদিকে ও কোথায় যাচ্ছে? এক মুহূর্তে প্রতীকের মনে হয়, বলবেনা ভেবেও কথাটা বলে কি সে ভুল করল? ঋকের মাথা অল্পেতেই গরম হয়ে যায়। কিন্তু না বললেও শে মনে একটাভার বোধ করত। তার একজন প্রিয় বন্ধু যে মেয়েটির জন্যে দিনরাত পাগল, ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করছে এ্যাতোদিন, তাকে যদি হঠাৎ অন্য ছেলের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করতে দ্যাখে, তাহলে বন্ধুকে জানানো, সতর্ক করে দেওয়াই তো তার কাজ। কিন্তু অতো রেগেমেগে ঋক কোথ ায় যাচ্ছে? কিছু একটা ফ্যাসাদ বাধিয়ে বসবে না তো...। ভিড়ের মধ্যেঋক মিশে গেছে। প্রতীক তাকে আর দেখতে পেল ন া। সাইকেলের প্যাডেলে চাপ দিয়ে সে নিজের বাড়ির দিকে চলল।

টেলিফোন বুথের স পরিসরে দাঁড়িয়ে ঋক উত্তেজনায় নিজের ভেতরে বাঁশপাতার মত কাঁপছিল। দুটো ক্যাবিনেই দুজন ফোন করছে। তার সামনের ক্যাবিনে এক মহিলা রিসিভার কানে লাগিয়ে খুব হাসছে। সাসির শব্দ শুনতে পাচ্ছে না ঋক। শুধু গাঢ় লিপস্টিক - রঞ্জিত দুই ঠোঁটের মাঝে ঝকঝকে দাঁতের সারির উদ্ভাসন তার চোখে পড়ছে। ওপারের লোকটি ক াচের দরজা ঠেলে বেরিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে ঢুকে গেল ঋক।

পরিমিতার বাড়ির নাম্বারে ডায়াল ঘোরালো ঋক। পরপর তিনবার নেগেজড্ সাউন্ড। ...ওহ্ গড্ ?

চারবারের বার সফল ঋক। পরিষ্কার রিং হচ্ছে। এবং হ্যালো বলে উত্তর দিল পারমিতার বিনবিনে স্বরই।

--- আমি ঋক বলছি ---।

ও প্রান্তে থমকানো নীরবতা।

তারপর--- কী ব্যাপার? এরকম অসময়?

---আমাকে এক্সপেক্ট করোনি বোধহয়?

--- কী ব্যাপার? বলো...। উচ্ছ্বাসহীন পারমিতার গলা।

--- তোমার সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলতে চাই। এখনই।

--- এখনই কিভাবে সম্ভব ?

--- মাত্র পাঁচ মিনিট।

--- এখনই সম্ভব না। বাবা - মা অফিস থেকে ফিরবে।

--- এখনই কথা বলতে চাই। অপেক্ষা করতে পারব না।

--- কী পাগলামী হচ্ছে ?

--- যাদি এখনই তোমার সঙ্গে কথা বলতে না পারি, তাহলে আমি রাতে ঘুমের ওষুধ খেয়ে...।

--- এসব আবার কী ন্যাকা ন্যাকা কথা ?

--- পাঁচ মিনিটের জন্য যদি না দ্যাখা করো, তাহলে আমি লিখে রেখে যাব --- আমার মৃত্যুর জন্যে তুমিই...।

--- ওহ স্টপ লিদস বুলশীট্? কোথায় দ্যাখা করতে হবে ?

--- মালির বাগান মাঠে।

--- পাঁচ মিনিটের জন্যে কিন্তু...। দেরী করতে পারব না আমি। রিসিভার নামিয়ে রাখে ঋক।

।। ছয় ।।

তাকে রীতিমত অগ্রাহ্য করে ঋক ওভাবে বাড়ি থেকে বেবিয়ে যাবার পর রাগে জ্বলতে লাগল শর্মিষ্ঠা। কী ভীষণ অসভ্য, জেদী, একগুঁয়ে আর অবাধ্য হয়ে যাচ্ছে ছেলেটা? না হয় পেটে ধরেই নি, তাই বলে এ্যাতো অপমান, তুচ্ছ - তাচ্ছিল্য করবে তাকে? টিভির সিনেমাটা অসহ্য লাগছিল। রিমোটের বোতাম টিপে অফ করে দিল। তারপর ফাঁকাঘরে বিছানায় বসে কাঁদল অনেক্ষণ। গত দশ বছর ধরে ঋকের মা হবার অনেক চেষ্টা করেছে শর্মিষ্ঠা। সফল হয়নি। এ বাড়িতে ঢুকেই সে লক্ষ্য করেছিল ছেলেটা তাকে আদৌ মেনে নিতে পারছে না। কতো আদর যত্ন করতে গ্যাছে। ঋক তা ফিরিয়ে দিয়েছে। কেন ? ওর মায়েরর মৃত্যুর জন্য কি ঋক শর্মিষ্ঠাকেই দায়ী করে নাকি মনে মনে? তার কি দোষ? সে তো শুধু ভালে াবেসেছিল ঋকের বাবা সৌভিককে। সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ার ব্যাপারে সৌভিকেরও চেষ্টা কম ছিল না। সে বিবাহিত। ত াদের এই সম্পর্কের কোনো পরিণতি নেই। এটা ভেবে শর্মিষ্ঠা অনেকবারই সরে আসতে চেয়েছে সৌভিকের কাছ থেকে।

কিন্তু জেদী, অপ্রতিবোধ্য, নাছোড় তো ছিল সৌভিকই। কোলাঘাটের বাংলোর সেই রাতটার কথা মনে পড়ে শর্মিষ্ঠার। সকালে যাব, সন্ধের মধ্যে ফিরে আসব--- এরকম বলে সৌভিক অভিসের গাড়িতে তাকে নিয়ে যায় কোলাঘাটে। ওখানে থার্মল পাওয়ার অফিসে সৌভিকের কাজ ছিল এটা ঠিক। রূপনারায়ণ নদীর ধারে দোতলা বাংলোর ছিমছাম একটা ঘরে শর্মিষ্ঠা বিশ্রাম নিচ্ছিল। মনে পড়ে ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকেছিল সৌভিক। আলিঙ্গনে, চুমোয়, দংশনে অপ্রস্তুত শর্মিষ্ঠাকে প্রায় পাগল করে দিয়েছিল। মাটিতে হাঁটু মুড়ে বসে নিজেরঝাঁকড়া - চুলের মাথা শর্মিষ্ঠার প্রকাশ্য জংঘায় স্থাপন করেছিল সৌভিক, চুমু- খাচ্ছিল তার নিম্নাঙ্গের সর্বত্র আর বলছিল-- আর পারছি না। তুমি মত দাও। আমি বিভোর্স স্যুটের পিটিশান করব। বইয়ে.র সঙ্গে থাকতে আমার একমুহূর্ত ভালো লাগে না...। কিন্তু তবুও শর্মিষ্ঠা মত দ্যায়নি। বোঝাতে এবং শান্ত করতে চেয়েছিল সৌভিককে। বলেছিল একজনকে জীবনের নিশ্চিন্ততা থেকে বঞ্চিত করে, তাকে সৌভিক আবার বিয়ে কক--- এটা সে চায় না। কেউ অসুখী হলে সেই অসুখের প্রভাব শর্মিষ্ঠাদের নতুন জীবনেও পড়তে পারে। তারপর একদিন ঋকের মা ভাগ্যের অদ্ভুত খেলায় নিজেই সরে গেলো পৃথিবী থেকে। কিন্তু তার অভিশাপ কী রয়ে গেলো শর্মিষ্ঠার জীবনে। না হলে কেন সে মা হতে পারল না? সৌভিকের কাছে, নিজের কাছে, সমাজের কাছেও নারী হিসেবে পরিপূর্ণতা পেল না। পাবেও না কোনোদিন। ডাক্তার কনফার্ম করেছে। এ শর্মিষ্ঠারই শারীরিক ত্রুটি।

কিন্তু নিজে মা হতে না পারলেও, যে কোনও মেয়ের মতই সন্তান--- আকুলতা তো তারও আছে। নিজের জীবনের তামাম ব্যর্থতা ভুলে থাকবার জন্যই শর্মিষ্ঠা মনে মনে চেয়েছিল ঋক তার কাছে আসুক, তাকে মা বলে গ্রহণ কক। কিন্তু বৃথাই সেই চাওয়া। তাকে যাতে মা বলে না ডাকতে হয়, তার জন্যে ঋকের প্রাণপণ চেষ্টা ঠিকই বুঝতে পারে শর্মিষ্ঠা। দুর্ভাগ্য ত ার। ঋক তাকে চিনতে পারেনি। কিংবা সে নিজেকে বোঝাতে পারেনি ঋকের কাছে।সে য়ে ঋকের বালো চায় সেটাও বোঝ াতে পারেনি। ঋকের স্বভাব-চরিত্র যাতে ভাল হয়, পড়াশোনা করে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে যাতে সে একটা ভদ্রস্থ জীবন পেতে পারে, তার জন্যেই তো শর্মিষ্ঠা সর্বদা ঋকের পেছনে লেগে থাকে, ---তাই নয় কী? ...এ্যাতো কম বয়সেই যে ছেলেটা বিড়ি-সিগারেট ধরেছে, তাতো আজকাল বুঝতেই পারে শর্মিষ্ঠা।ঋকের পাশ দিয়ে যাবার সময় পোড়া তামাকের গন্ধ প্রায়শই তার নাগে লাগে। সৌভিকের অবশ্য এসব ব্যাপারে খুব একটা মাথা ব্যথা নেই। এটাও শর্মিষ্ঠার পছন্দ নয়। ঋকের সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে মাঝে মাঝে অবশ্য ছেলেকেতখনকার মত ধমকায় সৌভিক। কিন্তু অধিকাংশ সময়েই বলে---লেট হিম গো টু হেল। অনেক বলা হয়েছে। যদিনাশোনে নিজের ভাগ্য নিজে গড়বে। ও ঠিক ্যর মায়েরর মতন। চ াপা আর একগুঁয়ে নিজে যা ভাল বুঝবে করবে।...

'ও ঠিক ওর মায়ের মত' ---কথাটা আঙুলের ডগায় আলপিনের তীক্ষ্ণতার মত অস্পষ্ট যন্ত্রণা দ্যায় শর্মিষ্ঠাকে। আসলে সৌভিকও বড় হতাশ, বুঝতে পারে শর্মিষ্ঠা। সৌভিক যা চেয়েছিল তার কাছে থেকে --- পায়নি।

ভাবতে ভাবতে কখন যেন শর্মিষ্ঠা ঋকের ঘরেই ঢুকে পড়েছে। ... বাড়ির পেছনদিকে এই ঘরটা। আবছা অন্ধকার যেন জমতে শু করেছে ঘরের মধ্যে। সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দেয় শর্মিষ্ঠা। ইস্-কী যে অগোছালো করে রেখেছে ছেলেটা ঘরট াকে। সবকিছু ছড়ানো--- ছিটোনো। এলোমেলো। দেওয়ালের র‍্যাকে বই-খাতা, পত্র - পত্রিকা, সব বিভূত কিমাকার হয়ে পড়ে আছে। সেগুলো গোছাতে গোছাতে বই-কাগজের ফাঁকে সে দেখতে পায়ে একটা অ্যাশট্রে। সিগারেট - টিপ্‌সে বোঝ াই। বাড়িতেও আজকাল সিগারেট চলে! কখন চলে?!

বিছানার চাদরের দিকে নজর যায় শর্মিষ্ঠার। চাদরের রং চেনাই যাচ্ছে না--- এ্যাতো নোংরা! এটা অবশ্য সবটা ঋকের দোষ নয়। শর্মিষ্ঠারও। সেও এই ঘরে প্রায় ঢোকে না। বেড-কভার টেনে তুলতে দেখেতে পায় বেডশীটের অবস্থাও তথৈবচ। চিরকুট্টি ময়ালা হয়েছে বেডশীটটা। ইস্ ছেলেটা ঘমোয় কী করে এর ওপর? ... বেডশীটে একটান মারতেই শতরঞ্জ - প্য াটার্ণের তোষক। আর তোষকের ওপর ওগুলো কী? এততাড়া চিঠির বান্ডিল মনে হচ্ছে? কার চিঠি, এ্যাতোগুলো চিঠি কে লিখেছে ঋককে?! ওগুলো সে ওবাবে লুকিয়েই বা রেখেছে কেন? ... মাথার মধ্য দুর্দান্ত গতিতে একটা ট্রেন ছুটে য াচ্ছে। একের পর এক চিঠিগুলো পড়তে থাকে শর্মিষ্ঠা। পড়তে থাকে আর বিস্ময়ে এবং রাগে চিড়বিড় করতে থাকে তার শরীর। এতদূর অধঃপতন ক্লাশ টুয়েলভের একটা ছেলের ভাবতেই পারে না সে।

পারমিতা নামের এক ঝি-বখাটে মেয়ের চিঠিগুলো লিখেছে।

...তোমার হাত আমার শরীর ছুঁলেই মনে হয় ইলেকট্রিক শক্ পাচ্ছি। খানিকবাদে তোমার দস্যু হাত যখন কিছুতেই কে

ানো বাধা মানে না, আমি ছেড়ে দিই নিজেকে। আরামে আমার চোখ বুজে আসে...। বারবার তুমি কেন আমাকে জিজ্ঞেস কর আমি তোমাকে ভালোবাসি কিনা? ভালোবাসি কী মুখে লে বোঝানো যায় ? তুবুও বলছি -- ভালোবাসি ভালোবাসি ভালোবাসি...। হাজারবার, লক্ষবার, এরকম লিখলেও কী তুমি বুজবে না?...

ইস্ কী অশ্লীল ভাষা মেয়ের, সর্মিষ্ঠার মনে হয়, এই তো একটা চিঠিতে লেকা আছে--- তোমার ওখানে একশো চুমু...। ...ভদ্রঘরের মেয়ে এরা? ছেলেটা যে ভেতরে ভেতরে এরকম পচে নষ্ট হয়ে গেছে, সেটাসে অগে বুঝতেপারেনি কেন? চ াদরহীন নোংরা তোষকের ওপর কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ে শর্মিষ্ঠা। ছড়িয়ে থাকা পালকের মত চিঠিগুলো চারপাশে ছত্র াকার হয়ে থাকে। মনে হচ্ছে, দেশলাই কাঠি জ্বেলে এখনই পোড়ায় ওই বিশ্রি লেখায় ভর্তি কাগজগুলো। তারপরই ভ াবে--- ঋককে দিয়েই ওগুলো পোড়াবে। আজ বাড়ি ফিক ছেলে। হুলস্থুল বাধাবে সে...।

।। সাত ।।

এই মাঠটার নাম যে কেন মালির বাগান রাখা হয়েছে তা কেউই জানে না। এখানে মালি কেউ নেই। বাগানেরও কোনো চিহ্ নেই। মাঠই বা কতটুকু অবশিষ্ট আছে। ক্রমশ বহুতলল বাড়ির সারি গ্রাস করে নিচ্ছে মাঠকে। কয়েক বছব আগেও এই মাঠে রীতিমতো হইচই সহকারে খেলাধুলো করত এলাকার ছেলেরা। কিন্তু করে যেন একদিন প্রোমোটারের লোভ-চকচকে নজর পড়ল এখানে। একই ধাঁচের উঁচু উঁচু ফ্ল্যাটবাড়িতে ছেয়ে গেল মাছ। দক্ষিণদিকে এখনও অসমাপ্ত কিছু ফ্ল্য াটের আনাচকানাচগুলো সন্ধের পর হাইড-পাক হয়ে যায়। অন্ধকারের নিরাপদ আড়ালে এলাকার উঠতি প্রেমিক-প্রেমিক ারা এখানে পরস্পরের প্রতি অবাধে প্রেম বিনিময় করে। কিছুদিন আগেও ঋক এবং পারমিতা ছিল তাদের মধ্যে একজোড় া।

আজ বহুদিন পর পিলারগুলোর আড়ালে ওদের দুজনের ছায়ামূর্তি। কথোপকথন চলছিল এরকম---

--- হঠাৎ এ্যাতো জরী তলবের কারণ?

--- গত তিন সপ্তাহ আমাদের একবারও দেখা হল না কেন?

--- কৈফিয়ৎ দিতে পারব না।

--- সব সময় অর্ণবই নিয়ে নিচ্ছে তাই না ? আমার জন্যে আর কিছু থাকছে না। অস্বত্বিকর নীরবতা কিছুক্ষণ।

তারপর---

--- হ্যাঁ অর্ণবের সঙ্গেও আমার বন্ধুত্ব আছে। তাতে কী হয়েছে?

--- শুধু বন্ধুত্ব ? কই অর্ণব তোমার বন্ধু আমাকে তো জানাওনি ?

--- সব কী তোমাকে জানাতে হবে ? তুমি কি আমার গার্জেন ?

--- বন্ধুত্ব থাকা এক কথা। আর রাস্তার অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কথা বলা আর এক কথা।

--- তুমি কী ভেবেছো বলো তো ? আমি তোমার কেনা বাঁদি? তোমার সঙ্গে ছাড়া আর কারোর সঙ্গে কথা বলতে পারব না ?

--- অর্ণবের সঙ্গে মেলামেশা তোমায় বন্ধ করতে হবে । নইলে ---

--- নইলে কী? বলো---। তবে তুমিও শুনে রাখো তোমার সঙ্গেই আমি বরং মিশতে চাই না।

--- কেন ?

--- সব কেন-র কী উত্তর হয়? আমার যাকে ভালো লাগে তার সঙ্গেই তো মিশব।

--- তাহলে আমাদের এ্যাতোদিনকার মেলামেশা, চিঠিপতত্র--- সব মিথ্যে?

উত্তর নেই।

--- সব মিথ্যে?

উত্তর নেই।

--- বলো ? চুপ করে আছো কেন? তাহলে এই তোমার আসল রূপ ? তুমি এ্যাতোদিনে আমার সঙ্গে ছেনালি করেছো?

--- বাজে কথা বলবে না।

--- তোমাকে আমি ---
চাপা হিংস্রতায় ঋক পারমিতাকে আঁকড়ে ধরে।
--- ছাড়ো আমার গায়ে হাত দেবে না। আমি কিন্তু চেঁচিয়ে লোক ডাকব।
--- বেইমান। প্রতারক। বেশ্যা। তোমার মুখ আমি অ্যাসিড দিয়ে পুড়িয়ে দেব।
--- এই জন্যেই তো তোমাকে ভালোবাসা যায় না। তুমি একটা রাস্টিক। তোমার মধ্যে লাস্ট ছাড়া আর কিছু নেই। অর্ণবের সফিসটিকেশসনের সঙ্গে তোমার তুলনাই হয় না।
--- শালী। তোর মুখ আমি ছুরি দিয়ে ফালাফালা করে দেব...।
--- ক্ষমতা থাকলে কোরো। মনে রেখো আমার বাবা মিনিস্টারের প্রাইবেট সেক্রেটারি।...আমি চললাম। আর কোনদিন বিরক্ত করবে না আমাকে...।
পারমিতা চলে গেল। জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে দেখল ঋক। রাস্তার আলোকোজ্জ্বল ভিড়ে মিশে গেছে পারমিতা। ...তোমার মধ্যে লাস্ট ছাড়া আর কিছু নেই? ... অর্ণবের মধ্যে আছে --- না? ঠিক আশে শালা--- আমিও দেখে নেব। তোমাকে সহজে ছাড়ব না আমি...।

।। আট ।।
হাওয়ার দাপটে প্রতিরোধহীন একটা ঝরে যাওয়া পাতার মত এলোমেলো, উদ্দেশ্যবিহীন এ-রাস্তা সে-রাস্তা ঘুরতে ঘুরতে ঋক্ শেষ অব্দি নিপায়, নিজের বাড়ির দরজায় কাছে ফিরে এল। এখন রাত কটা বাজে? তার হাতে ঘড়ি নেই। আটটা স াড়ে আটটা হবে। ডোর - বেলে চাপা দ্যায় সে। দরজা খোলে না। আবার জোরে চাপ ডোর-বেলে। খুব দূরে- ফিনফিনে ক াচের বাসনকোসন ভেঙে চুরমুর পড়ে যাবার আওয়াজ ডোববেলের। দরজা খুলছে নাকেন? এই আর এক বিশ্রি মহিলা আছে বাড়িতে। এমন টিভি চলছে যে কোনো আওয়াজই যাচ্ছে না কানে।
আবার আঙুলের চাপ দিতে যাবে ডোর বেলে। দরজাটা খুলে যায়। রাগে এবং বিরক্তিতে কালো থমথমে মুখ শর্মিষ্ঠার। বিদ্যুতের ঝলসানির মত ঋকের দিকে একবার তাকিয়েই সে সিঁড়ি দিয়ে উঠে যায়।
দরজা বন্ধ করে ঋকও সিঁড়ি দিয়ে ওঠে। সে অনুভব করে মাথার মধ্যে হিম হয়ে আছে --- শূন্যতা আর অবসাতষ কপ ালের দু-পাশের রগ যেন লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে। এই মুহূর্তে কিছুই ভালো লাগছে না ঋকের । শুধু অন্ধকারে শুয়ে থ াকতে ভালো লাগছে। ঘরের আলো নিভিয়ে সে বিছানায় নিজেকে ছুঁড়ে দেয়।
---এরকম অসময়ে যর অন্ধকার করে শুয়ে আছ যে? শর্মিষ্ঠা সুইচ টিপে আলো জ্বালে। ফ্লুরোসেন্ট আলোর ঝলক সাঁৎ করে বিঁধে যায় ঋকের চোখে।
---উঃ এখন আলো জ্বালতে কে বলল তোমাকে ? ইচ্ছেমত একটু শুয়ে থাকতেও কি পারব না আমি?
---নাহ, পারবে না। কোনো শাসন নেই বলে নিজের উচ্ছেয় অনেক নেমেছো তুমি। আর নামতে দেব না...।
---কী বলতে চাও ? চোখ লাল করে ঋক বিছানয়া উঠে বসে।
--- এগুলো কী?
বিস্ফারিত চোখে ঋক দেখে। যেন দুই আঙুলে কোনো থ্যাঁতলানো ইঁদুরের লেজ ধরে দোলাচ্ছে ভাষণ ঘেন্নায়, এবাবে শর্মিষ্ঠা আলতো ধরে আছে চিঠিভর্তি ছেঁড়া খাম। কিরকম একটা নারকীয় হাসি তার ঠোঁটে। চোখে আগুনের হালকা। খ ামটা দোলাচ্ছে শর্মিষ্ঠা।
---বলো--- কী নাম সেই মেয়ের? কোথায় বাড়ি? তার বাবা-মায়ের সঙ্গে আমরা কথার বলব। একটা খারাপ মেয়ে পা ল্লায় পড়ে তুমি---
---তুমি আবার ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাচ্ছো কেন? গরগর করছে ঋক।
---যার গলা টিপলে দুধ বেরোয় এখনও, তার আবার ব্যক্তিগত ব্যাপার কী? ওঠো- উঠে এসো বলছি। এইসব নোংরা ক াগজ একটা একটু করে পোড়াতে হবে তোমাকে। নিজের হাতে। আর ওই মেয়েটার সঙ্গে মেলামেশাবন্ধ করতে হবে। দাঁড় াও তোমার বাবা ফিক বাড়িতে। তারপর হবে তোমার... ইতিমধ্যে পাখার হাওয়ায় শর্মিষ্ঠার দু- আঙুলের তাচ্ছিল্যে

দুলতে থাকা খামের ভেতর থেকে চিঠিগুলো একটা একটা করে খসে পড়তে থাকে মেঝেতে। যেন একঝাঁক আরশোলা। ফর্ফক শব্দে কাগজগুলো ওড়ে। ফ্যানের হাওয়ার দাপদে ওলট - পালট খেতে থাকে উল্লাসে ঘরের মেঝেতে। একটা ক াগজ শর্মিষ্ঠার ডান পায়ের পাতার কাছে এসে তিরতির কাঁপছে। সুরসুড়ি দিচ্ছে শর্মিষ্ঠা পায়ে।

--- ধ্যাৎ --- পা দিয়ে কাগজটাকে দূরে সরিয়ে দেয় সে আর গুমগুম শব্দে কাঁপতে থাকা আগ্নেয়গিরিটা ঋকের মাথায় এই মুহূর্তে জ্বালামুখ ফাটিয়ে তপ্ত - গলিত লাভাসমেত ছিটকে ফেটে পড়ে যেন। তার মনে হয়ে তাকে সম্পূর্ণ নাঙা করে ওই মহিলা প্রকাশ্য রাস্তায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। নিজস্ব গোপন বলতে তার আর কিছু নেই। গলিতথকথকে লাভার তৃপ্ত স্ব াদ চোখে - মুখে - কানে - ঠোঁটে---। লাফিয়ে বিছানা থেকে নামে ঋক। তারপর ঘরের কোণ থেকে এক হ্যাঁচকায় বহুদিনের অব্যবহৃত, ঝুল - লাগা ত্রিগেট ব্যাটটা টেনে নিয়ে সে বেগে নামিয়ে আনে শর্মিষ্ঠার মাথার ঠিক মর্ধিখানে। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য ঋক, রাগে, হিংসায়, ক্ষোভে, প্রতারিত হবার গাঢ় বেদনায় উপর্যুপরি আঘাত করতেই থাকে। আঘাত করতেই তাকে।...

খুব দ্রতু গতিতে ছুটতে ছুটতে কোনো গাড়ি, আচমকা কোনো কারণে ব্রেক কষলে টায়ারের দাঁত আর পিচরাস্তার মসৃণত ার বিপরীতমুখী ঘর্ষণে যেরকম কি-চ-চ্ কিংবা য-স্-স্-স্ আওয়াজ হয়, যে আওয়াজে শ্রোতার কিরকিরে অনুভব হয়, ঠিক সেরকম অস্ফুট অস্বাভাবিক এবং বিশ্রী একটা আওয়াজ শোনা গেল শর্মিষ্ঠার গলা থেকে। যেন অনেক অনেক উঁচু থেকে শূন্যে ঘুরপার খেতে খেতে পড়ে যাচ্ছে সে এভাবে সে দই হাতের মুঠোয় কিছু একটা আঁকড়ে ধরার শেষ চেষ্টা করছিল। ঠিক এই সময়েই সে মেঝেতে ধপ্ শঙেদ পড়ে যায়। তার শরীরটা দু-তিনবার কেঁপে ওঠে। তারপর নিথর হয়ে য ায়। ঋক দেখে পারমিতার বেশ কিছু চিঠি শর্মিষ্ঠার শরীরের নীচে চাপা পড়ে গেছে। হাতের ব্যাট ততক্ষণে সে ছুঁড়ে দিয়েছে ঘরের কোণে। ওই ব্যাটের কানায় কী রক্ত লেগে আছে? শুধু ব্যাটেরর কানাতেই বা কেন? গাঢ় রক্তের একটা ফিনফিনে ফিতে - সদৃশ স্রোত শর্মিষ্ঠার মাথার ঠিক উপরিভাগের স ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে, কানের পাশ দিয়ে, ফর্সা ঘাড় ও কাঁধ অতিত্রম করে ধেয়ে আসতে ঋক যেখানে দাঁড়িয়ে আছে--- সেখানেই। রক্তের সেই রেখা যাতে তার পা ছুঁতে না পারে, হৈ সতর্কতায় ঋক পা সরিয়ে নেয়, কিন্তু এটা কী রক্তের রেখা না একটা লালবর্ণ হিলহিলে সাপ? .... কেননা ঋক যেদিকে পা রাখে, সাপটিও সেদিকে ঘুরে যায়। প্রবল ভয়ে ঋক এই মুহূর্তে মুহ্যমানন, বীভৎস - দর্শন সেই লালবর্ণ সাপ স্পষ্টতই ত াকে ছুঁতে চাইছে।

ভীষণ বিপন্ন বোধ করে ঋক। ঘর থেকে বেরিয়ে পারলারে আসে, পরমুহূর্তেই লাফিয়ে সিঁড়িতে। এক এক লাফে সিঁড়িগুলো পেরিয়ে যত দ্রুত সম্ভব দরজা খোলা সে। একবার পেছনে তাকায়। হ্যাঁ। আসছে সেই সাপ-লালবর্ণ, মেদণ্ডহীন স শরীরটাকে বাঁকিয়ে এগিয়ে আসছে তার দিকে।

ঋক রাস্তায় নামে। ছুটতে থাকে। ছুটতে থাকে। বিদ্যুৎ চমকেরে মত তার মনে হয়, অনুসরণকারী ওই হিংস্র সাপটির কাছ থেকে তার পরিত্রাণ নেই। সারা জীবন জাগরণে, ঘুমে, স্বপ্নে. তাকে তাড়া করে যাবে ওই সাপ।

পরিপূর্ণ সন্ধের আলো - ঝলমল শহর, ধাবমান ট্রাফিকের অনর্গল স্রোত, মানুষের চাপ চাপ ভিড়, সিগন্যালের রক্তচোখ, --- সবকিছু অগ্রাহ্য করে ঋক প্রাণপণে ছুটছে। ছুটছে ছুটতে বিমূঢ়ের মত বারবার পেছনদিকে তাকায়। হ্যাঁ কোনো ভুল নেই। ওই তো সাপটা সেই একইভাবে এগিয়ে আসছে। রাস্তার নিয়ন আলোর প্রতিফলনে চাবুকের মত দীর্ঘ তার শরীর চিক্‌চিক্ টিকচিক্ করে। সামনেই চৌরাস্তার বিভ্রান্তি। কোন্‌দিকে যাবে ঋক। কোন্ রাস্তা ধরবে? এভাবে কতদূর যাবে? পৌঁছবেই বা কোথায়? ঋকের মনে হয়, বিকট শব্দ করে তার ভেতরে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ছে বিশাল, চারপাশের ধূসর বাড়িঘর ঠিক তার সামনেই একটা হাইরাইজের ছাদ থেকে টিভির অ্যান্টেনাগুলি ঝাঁক ঝাঁক ভল্লের মত উড়ে আসছে ত ার দিকে। সে আর কিছু ভাবতে পারে না। ভয়ে বুজিয়ে ফ্যালে চোখ। শত্রু-পরিবৃত অভিমন্যুর ত চারিদিকে থেকে আত্রান্ত হবার যন্ত্রণায় রাস্তার ওপরই হাঁটু মুড়ে বসে পড়ে সে। দুই হাতের চেটোয় ঢেকে ফ্যালে মুখ। কান্নার এক প্রবল চাপ ভেতর থেকে ছিন্নভিন্ন করে দ্যায় তাকে...।

सृष्टिसन्धान

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com